ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 316- 321
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.213

গল্পের মোড়কে অন্ত্যজশ্রেণির বাস্তব সংগ্রামের আখ্যান: প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠির দেশ’

অনুরাধা দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

Received: 22.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Within the vast landscape of Bengali literature, stories focusing on the working class, especially labourers occupy a significant and unique space. Various storytellers and novelists have brought the lives of these marginalised communities into the forefront of literature through their writings. Among them, Shailajananda Mukhopadhyay is a pioneering and foremost figure. In his collection of stories, he powerfully depicted the horrific plight and deeply miserable lives of coal mine workers, which were full of suffering, hardship and exploitation. By focusing on their narratives, he not only brought their stories to light but also initiated the trend of regionalism in Bengali literature, essentially becoming the first author to discover and focus on the coal belt region. When he wrote this coalfield stories, he didn’t solely emphasize the poverty of the workers. Concurrently, he skilfully portrayed the sexually- driven instincts and their carnal appetites that existed among the coal mine labourers. Through his narratives, he successfully reflected a specific region and the lifestyle of its inhabitants to the reading public. Furthermore, he painted a realistic picture of the owner-labourer relationship prevalent in the mining areas.

Keywords: Coal mine worker, Hardship, Poverty, Regionalism, Exploitation, Sexually-driven instinct, Bengali short stories

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের এক অপচয়িত প্রতিভা। বহুপ্রসবী তাঁর রচনা। তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে কয়লাকুঠির ‘মুনিষ’, বস্তির অবক্ষয়িত সমাজ, নিতান্ত নিম্নবিত্ত লোক। এদের নিয়ে শৈলজানন্দের বেশি সংখ্যায় লেখা রয়েছে। দরিদ্র লাঞ্ছিত মানুষের চরম যন্ত্রণা ও বঞ্চনা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, কারণ নিজের বাল্য-শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি ছিল দারিদ্রতায় ক্লিষ্ট। যৌবনের নববিবাহিত দিনগুলি কেটেছে নিদারুণ অর্থকষ্টে। তিনি তাঁর দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন কখনো কেলিয়ার সামান্যতম চাকরিতে, কখনো ধোপাবস্তিতে, কখনো বন্ধুদের মেসে নিঃস্ব অবস্থায়। বেঁচে থাকার অন্বেষণে তিনি অবলম্বন করেছিলেন নানা বৃত্তি। কখনো কয়লাকুঠির চাকরি, কখনো বা কুমারডুবির লোহার কারখানার কাজ। কোনো কাজই তাঁকে সুখের সন্ধান দিতে পারেনি, কিন্তু বেঁচে থাকার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন দেখা শিখিয়েছে তাঁকে কয়লাকুঠির জীবন।

অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে মানুষের জীবনে যে ধরনের প্রবৃত্তি মাথাচারা দিয়ে ওঠে বা মানুষকে কোন পথে চালিত করে সে সম্পর্কে শৈলজানন্দের সত্য ধারণা তথা অনুভব ছিল বলেই তিনি অনায়াসে তাঁর লেখনীতে সেইসব মানুষের কথাগুলোকে তুলে ধরতে পেরেছেন। এইসব রচনার জন্য তাঁকে কখনো কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি কারণ তিনি নিজেই এই বাস্তব ভূমিতে বিচরণ করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে-

> *"শৈলজাবাবুর পাত্র-পাত্রী অত্যন্ত গরীব গৃহস্থ, মেষ-শাবকের দল, কুলী, মুটে-মজুর, বস্তির অধিবাসী কিম্বা বাঁকুড়া বীরভূম জেলার গ্রামবাসী।"* [১]

রাঢ় অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিতে বেড়ে উঠেছেন শৈলজানন্দ। কয়লাখনির অঞ্চলের জনজীবন, তাদের আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কার সংস্কৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর মনের যোগ। সেই মনের দেখাকে সম্বল করেই তিনি তাদের চিত্র এঁকেছেন তাঁর লেখনীতে এবং তাদের জীবন্ত করে রেখে গেছেন গল্পের মধ্য দিয়ে।

বাঙালি পাঠকের কাছে এর আগে পর্যন্ত কয়লাকুঠির মানুষের জীবনকাহিনি, তাদের বঞ্চনার কথা এতটা প্রখরভাবে ধরা দেয়নি। শৈলজানন্দই প্রথম তাঁর লেখনীতে এদের বঞ্চিত জীবনভাষ্য অনুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। বলা যায় তিনি যেন তাদের কথাগুলো বলার জন্যই সাহিত্যে পদার্পণ করেছেন। শৈলজানন্দের লেখায় যে একটি বিশেষ ভূখণ্ডের অন্তেবাসীদের কথা উঠে এসেছে এই বিষয়ে তাঁরই সমকালীন লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন-

> *"তারাশঙ্কর আমাদের সাহিত্যে যে জন্য স্মরণীয় তা হচ্ছে বাংলার আঞ্চলিক জীবনের ব্যাপক চিত্রন। সাহিত্যের এ বিভাগের পথিকৃত কিন্তু তিনি নন, তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগেই এই আঞ্চলিক সাহিত্যের সূচনা হয়েছে শৈলজানন্দের সৃষ্টিতে... শৈলজানন্দ শুরু করেছিলেন কিন্তু তাঁর কাজ তার যথোচিত পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন তারাশঙ্কর।"*[২]

'দিনমজুর' গল্পসংকলনের ভূমিকায় লেখক নিজেই বলেছেন-

> *"সাঁওতালদের লইয়াই আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের যাত্রা শুরু করি এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার সাঁওতালি গল্পগুলি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"* [৩]

মাত্র ২২ বছর বয়সে 'কয়লাকুঠি' গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করেন শৈলজানন্দ। গল্পটিতে তিনি কয়লাকুঠির সামগ্রিক একটি দিক তথা পরিবেশ তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র বাউড়ি সম্প্রদায়ের নানকু ও বিলাসি। গল্পটিতে বিলাসির সুতীব্র প্রেমের খিদে ও তার করুণ পরিণতি গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে দেখি বিলাসি তার স্ত্রী নানকুকে ভীষণ ভালোবাসে, কিন্তু তার স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত। সে অপর স্ত্রী মাইনুকে তার মন দিয়ে দেয়। এমনকি সেই স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কয়লাকুঠিতে কাজ করতে চলে যায় সে। স্বামী অন্য স্ত্রীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বিলাসিও রমনা নামে অন্য পুরুষের সঙ্গে থাকতে শুরু করে, দৈহিক সম্পর্কেও লিপ্ত হয়। কয়লা কুঠির শ্রমিকদের কাছে শারীরিক সম্পর্ক শুধু তৃষ্ণা মেটানোর মাধ্যম। বিলাসি রমণাকে তার শরীর দিলেও মনের এক কোণে এখনও সে নানকুকে ভালোবাসে। এভাবে কিছুদিন কাটার পর হঠাৎ করে সে একদিন জানতে পারে মাইনু মারা গেছে এবং নানকু ফিরে এসেছে। এতে তার মনে নানকুর প্রতি সুপ্ত প্রেম আবার জাগ্রত হয়। সে নানকুর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। খুশিতে আত্মহারা বিলাসি পরমুহূর্তেই জানতে পারে যে নানকু কয়লাখনিগর্ভে চাপা পড়ে মারা গেছে। ব্যথিত হৃদয়ে সে মদ্যপান করে এবং রমণাকে নিয়ে কয়লা খনিতে যায়। রমণা ইঞ্জিন চালিয়ে নীচে নামতে থাকে, হঠাৎ গাড়ি আটকে গেলে বিলাসি ভাবে সে হয়তো পৌঁছে গেছে এই ভেবে সে নামতে গিয়ে ৫০ ফুট নিচে একটি মৃতদেহের উপর গিয়ে পড়ে। সে দেহটি ছুঁয়ে বুঝতে পারে যে এই দেহটি নানকুর। সে মৃতদেহ নিয়ে বিলাপ করতে থাকে এমন সময় একটি বড় কয়লার চাংড়া পড়ে দুজনেই সমাধিস্থ হয় অপরদিকে রমনা উপরে বিলাসির অপেক্ষা করতে থাকে। এভাবেই চরিত্রের বেদনাঘন পরিণতিতে সমাপ্তি ঘটে 'কয়লাকুঠি' গল্পটির।

কয়লাখনির পরিবার নিয়ে রচিত অপর একটি গল্প 'মা'। এই গল্পটিতে সর্দার দুখন ও তার ভাইয়ের মেয়ে পরীর জীবনের অসহায় দিকটি ফুটে উঠেছে। কয়লাখনিতে খনিচাপা পড়ে মারা যাওয়া স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং এতে খনির মালিক তথা ম্যানেজারের কিছু যায় আসে না। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা অসহায়তা কখনো মালিকদের ছুঁতে পারেনা। তাই দেখি গল্পে যখন দুখনের ভাই ও ভাইয়ের পুত্র খনি গর্ভে পড়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়ে, তখন মালিকের নিকটস্থ হলে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়, মেলেনি মরণোত্তর কোন আর্থিক সাহায্য। কয়লাখনির জন্য শ্রমিকেরা তাদের জীবন ও যৌবন সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েও সুখের মুখ দেখতে পারেনা। মনে হয় যেন শোষণ হওয়ার জন্যই তাদের জীবন ও জন্ম। এই শোষণের যন্ত্রণা তিলে তিলে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং বেছে নেয় তারা আত্মহননের পথ যেমনটা দুখন বেছে নিয়েছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি। ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে পরীকে রেখেই দুখন মারা যায়। পরীর জীবনের স্বচ্ছতা নিরাপত্তা ও দুখনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে উঠে। টুরীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও লামার ছেলে টুরী কামনার তাড়নায় পরীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। ঘৃণায় অসহায় পরী জীবন থেকে নিস্তার পেতে

চেয়েছে, কিন্তু সে আত্মহত্যা করতে পারেনি তার গর্ভে থাকা সন্তানের কথা ভেবে। তাকে ঘৃণ্য কয়লাখনির পরিবেশের মধ্যে বাঁচতে হল।এই গল্পে মাতৃহৃদয়ের যে উপলব্ধি যে আবেগ তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত।

'মরণবরণ' গল্পে ধরা পড়েছে বৃদ্ধ কয়লাখনির শ্রমিকের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত জীবনের আখ্যান। কয়লাখনির এক শ্রমিক বৃদ্ধ ভটুল। বৃদ্ধ বয়সে সে এক তরুণীকে বিবাহ করে এবং সে অফুরান ভালোবাসে তার স্ত্রীকে কিন্তু উদ্বিগ্ন যৌবনা রুকিকে যৌন সুখ দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধ ভটুলের নেই। যৌবনে ভরপুর রুকি স্বামী থেকে সেই আনন্দ না পেয়ে সে গোপনে সাহেবের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং একটি পুত্র সন্তানের ও জন্ম দেয়। ভটুল এই সন্তানকে নিজের ঔরসজাত সন্তান ভেবে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বড়ো করতে থাকে, কিন্তু যেদিন সেই সত্যটি প্রকাশ পায় সেদিন ভটুল নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারে না। সহজ সরল ভটুল অবশেষে কয়লাখাদে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহননের পথটি বেছে নেয়। ভটুলের আত্মহত্যাতে রুকির বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তাকে দুঃখিত দেখা যায় যখন সাহেবের অন্যত্র বদলি হয়ে যায়। সে দুঃখিত মনে সাহেবকে বলে- *"আমাদের কোথায় রেখে যাবি সাহেব- আমরাও যাব।"* [৪] কিন্তু এতে সাহেবের মন বিগলিত হয় না। সাহেব রুকিকে ছেলেকে রসগোল্লা খাওয়ানোর জন্য দুটো টাকা দিয়ে মোটর চালিয়ে সেই স্থান ছেড়ে চলে যায়। আসলে এই গল্পের মুখ্য উপজীব্য বিষয় হচ্ছে কয়লাখনির মানুষের সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের জায়গাটি, তাঁদের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, তাঁরা মুক্ত ও স্বাধীন। তাদের এই মুক্ততাই তাদের বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমনকি তখন তাদের কাছে আত্মহননের পথটাই সহজ বলে মনে হয়। যা ভটুলের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শৈলজানন্দের 'নারীর মন' গল্পটিও উল্লেখযোগ্য। এই গল্পের প্রধান চরিত্র ভুলি। গল্পটি ভুলি, তার বোন টুরণী আর তার স্বামী পীরুকে কেন্দ্র করে ত্রিকোণ প্রেমের ছাঁচে লেখা। পীরু ভুলির বোন টুরণীর প্রতি আসক্ত। ভুলি এ ব্যাপারে সোচ্চার হলে স্বামীর হাতে তাকে কিল-চর-ঘুসি খেতে হয়। একবার যাত্রার আসরে ভুলি তার স্বামীকে টুরণীর সাথে বসে থাকতে দেখলে সে রেগে তেঁতে উঠে, সে টুরণীর চুল ধরে বাইরে নিয়ে এসে প্রহার করতে থাকে। কিন্তু পীরু রেগে গিয়ে ভুলিকে মারতে শুরু করে এমনকি সকলের সামনে বন্ধ্যা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। অপমানিত হয়ে ভুলি কয়লার ধাওয়ায় ফিরে যায়, সেখানে গিয়ে সে কিভাবে স্বামীকে জব্দ করবে সেই কথাই ভাবতে থাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে তার পুরনো প্রেমিকের কথা। প্রতিশোধলিপ্সু ভুলি তার পুরনো প্রেমিক ভোলাকে গিয়ে বলে যদি সে পীরুকে তার গায়ের জোরে হারাতে পারে তবে সে তার সঙ্গে 'শাঙ্গা' করবে। পুরনো প্রেমিক ভোলা ভুলিকে পাওয়ার আশায় একদিন কাজ থেকে আসার পথে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত পীরুকে আক্রমণ করে। গায়ের জোরে জেতা তো দূরের কথা, পীরুর কাছে অতি সহজে হার মানে ভোলা। এতে ভুলি দুঃখিত হলেও মনে মনে স্বামীর পৌরুষে গর্ববোধ করে। কিন্তু স্বামীকে শাস্তি দিতে সে ব্যর্থ হয়। যখন ভুলি আর কোনোভাবেই স্বামীকে জব্দ করতে পারল না তখন সে আসামের চা বাগানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আসামযাত্রী কুলির সঙ্গে টুরণীর যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভুলি বোনের বদলে চলে যেতে চায়। আসাম যাওয়ার জন্য সে ট্রেনে চড়ে বসলেও অন্তরের বিরহ বেদনা তাকে আষ্টেপিষ্টে ঘিরে ফেলে। তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার দুচোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরতে থাকে-

> *"ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছল ছল করিয়া আসিল। দূরে পলাশ বনের ভিতর দিয়া টুরণী ছুটিতে স্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়ে দেখিয়া লইয়া, ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।"* [৫]

ভুলির চোখের জল দেখে পাশের মেয়েটি ভুলিকে কাঁদছিল কেন বলে জিজ্ঞাসা করলে ভুলি অতি সহজে মিথ্যে হাসি হেসে মেয়েটিকে বলে *'ধ্যুৎ কাঁদব কেনো লো'*।

এই গল্পটির চরিত্রগুলো কয়লাকুঠির হলেও এই ঘটনা ও পরিণতি সর্ববিদ্যমান। নারীর মনের এমন রূপান্তর সব দেশে কালে প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। নারীমনের ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মান অভিমান, এবং সবশেষে স্নেহের দিকটিও আলোচ্য গল্পে যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে। শৈলজানন্দের গল্পগুলির মধ্যে চরিত্রের প্রতিবাদ মুখর হওয়ার একটা জায়গা ছিল কিন্তু শৈলজানন্দ এদের প্রতিবাদী করে তোলেননি বরং শ্রমজীবী মানুষের চরম দারিদ্র্য এবং এর সঙ্গে তাদের অনাবৃত জৈবিক প্রবৃত্তিকে মুখ্য করে তুলেছেন। 'ঝুমরু' গল্প দেখি বর্ষা দিনের শ্রমিকদের সমস্যার ছবি। বর্ষাকালে কাজের জন্য সবারই ছাতার প্রয়োজন কিন্তু তারা ছাতা কিনতে অসমর্থ। তাই তারা শিয়াড়ি পাতা দিয়ে ছাতা তৈরি করে ছাতার অভাব পরিপূর্ণ করতে চায়। তারা শিয়াড়ি পাতা আনার জন্য ম্যানেজারের কাছে ছুটি চাইলে তিনি

তাদের দাবি মানতে সম্মত হোননা, বরং তাদের রবিবার বন্ধ দিনে পাতা সংগ্রহ করতে বলেন। কর্মচারীরা এই কথায় কোনো প্রতিবাদ করেনা বরং নতমস্তকে তা স্বীকার করে নেয়। এখানে চাইলে শৈলজানন্দ তাদের প্রতিবাদের দিকটাও তুলে ধরতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তাদের অধিকারবোধ অপেক্ষা প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণা এবং কামতাড়িত জীবনের নানা সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

শৈলজানন্দ পাঠকের সামনে কয়লাখনির শ্রমিক ও কর্মচারীদের শোষণের যে চিত্র তা তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কয়লাখনির সাহেবেরা মজুরদের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তাদের মৃত্যু সাহেবদেরকে একটুও ভাবুক করে তুলে না। 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পটিতে শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিকদের শোষণের কদর্য চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পে দেখা যায়, খনির ম্যানেজার জেমস্ সাহেব মুনাফার লোভে শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন না। তার কাছে শ্রমিকদের জীবন শুধুমাত্র এক শ্রমিক রূপেই। ম্যানেজারদের এই উন্মাদ আকাঙ্খার বলি হয় সাধারণ শ্রমিকেরা। এই গল্পে দেখি রেজিংবাবু চঞ্চলের নির্দেশে কয়লা খাদে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে মৃত্যু হয় টুইলা নামের এক শ্রমিকের। খনির অতলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় সে কিন্তু তার মৃত্যুতে জেমস্ সাহেবের মুনাফা লোভের নেশা বিন্দুমাত্র টলতে দেখা যায় না বরং তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে জানান- *'কুছ পরোয়া নেই।'* কারণ এমন মৃত্যু কয়লাখনিতে অহরহ ঘটে থাকে। সাহেব এই সমস্ত কথায় কর্ণপাত করে মুনাফা লাভে বাধাপ্রাপ্ত হতে চায়না। উপরন্তু তিনি যেন-তেন প্রকারে রেজিং বাড়াতে ব্যস্ত হয়ে যান। টুইলার মৃত্যুর পর টুইলার বউকে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিতে নারাজ ম্যানেজার জেমস্। খনির রেজিংবাবু ম্যানেজারের কাছে টুইলার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দাবি জানালে ম্যানেজার তার উপর রেগে গিয়ে বলেন– *'Damn Your Tuila.'* এই কথা শুনে রেজিংবাবুর মনঃক্ষুন্ন হয়ে যায়। কয়লা খাদের অন্ধকারে বসে চঞ্চলবাবু যখন এ সমস্ত কথাই ভাবছিলেন তখন টুইলার বউ সোহাগী তাকে তার স্বামী ভেবে জড়িয়ে ধরে। এই ঘটনা জেমস্ সাহেবের নজর এড়িয়ে যায়নি, তিনি এরজন্য চঞ্চল বাবুকে বরখাস্ত করেন চাকরি থেকে। যেহেতু ম্যানেজার সোহাগীকে তার স্বামীর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ রূপে কোনো অর্থই দেয়নি তাই চঞ্চল বাবু যাওয়ার আগে তার শেষ মাইনেটুকু সোহাগীকে দিয়ে অন্যত্র চলে যান। চঞ্চল বাবু ফিরে যাওয়ার সময় দুঃখিত মর্মাহত হয়ে ভাবতে থাকেন-

> *"হে ভগবান! দাসত্বের পায়ে নিজের মনুষ্যত্বটুকু বিসর্জন দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আমাকে সে পাপের শাস্তি দিতে তুমি কুণ্ঠিত হইও না।"*[৬]

'জোহানের বিয়া' গল্পটিও কয়লাখনির পটভূমিকে আশ্রয় করে রচিত। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখী। এই নারী চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীর আপাত নির্দয় বুকে লুকিয়ে থাকা বেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন। ভরপুর যৌবনা সুখীকে পরিস্থিতির চাপে পড়ে খোঁড়া জোহানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু শারীরিকভাবে অসমর্থ জোহান উচ্ছলা সুখীর কামবাসনার তৃষ্ণা নিবারণ করতে অসমর্থ। তাই সুখী জোহানকে অবজ্ঞা করে চলে এমনকি তাকে স্বামীর দরজাটুকুও দিতে নারাজ। সে তার জীবনে স্বামী জোহানের উপস্থিতিকেও স্বীকার করতে চায় না। ঘটনাক্রমে জোহানের অপমৃত্যু ঘটলে সুখী তার হৃদয়ে থাকা জোহানের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করতে পারে। তার সুপ্ত ভালোবাসার কথা ভেবে সে দুঃখিত হয়ে পড়ে এভাবেই এই করুন পরিণতির মধ্য দিয়ে গল্পটির পরিসমাপ্তি হয়। এই গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক কয়লাখনি অঞ্চলের লোকেদের সারল্যময় ভালোবাসা ও বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এরকম নানা ছোটগল্প রচনার মধ্যে দিয়ে শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তাঁর এজাতীয় গল্পের প্রশংসা করে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন-

> *"শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০) বাঙলা কথাসাহিত্যে তাঁর কয়লাকুঠির গল্প দিয়ে একটা নতুন হাওয়া এনে দিয়েছেন। কয়লার খনি, তার কুলি-মজুর, সাঁওতাল নর-নারী, নিচুতলার মানুষদের বিচিত্র সমাবেশ – বাউরি-হাড়ি-ডোম, খনি জীবনের পরিবেশের মধ্যে এই অকিঞ্চন মানুষদের অনালোকিত দিনযাপন, একে অবলম্বন করে শৈলজানন্দ যেসব গল্প লিখেছেন, উপাদানের নতুনত্বের কারণেই শুধু নয়, সহানুভূতির বিস্তারের কারণেও এই গল্পগুলি সেদিন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং কালক্রমে এইভাবে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে যাকে আধুনিক বলতে বাধা নেই।"*[৭]

শৈলজানন্দের সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন-

> *"নিঃস্ব, রিক্ত বঞ্চিত জনতার তিনি প্রথম প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা এনেছেন। হাতির দাঁতের মিনার চড়া ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে।"*[৮]

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে অনুধাবন করলে দেখা যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের আদি-অন্ত জুড়ে রয়েছে কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলের শ্রমিকদের সরল ও সীমাবদ্ধ জীবনের প্রকাশ। দরদীপ্রাণ ও স্রষ্টার মানসিকতা ও দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন কয়লাখনির জগতে, বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের জীবনযাত্রা, সেখানকার রোদ-বৃষ্টির, হাসি-কান্নার গল্প। তিনি অশিক্ষিত শ্রমজীবী লোকদের জীবন সংগ্রামকে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। গল্পকার শ্রমজীবী লোকদের প্রাত্যহিক জীবনকে সাহিত্যে প্রাণবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন তাঁর গল্প রচনার স্বতন্ত্র শৈলীর মধ্য দিয়ে।

বিশিষ্ট সমালোচক গোপিকানাথ রায় চৌধুরী শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সম্পর্কীয় গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনা করেছে বলে জানিয়েছেন-

> *"কয়লাকুঠির গল্পগুলি বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজের একঘেয়ে প্রথাবদ্ধ জীবনে এক অনুস্বাদিত মুক্তির সুখ স্পর্শ বহন করে আনল। এক সজীব সতেজ জীবনরসের অফুরন্ত স্রোত প্রবাহিত করে দিল বাংলা কথাসাহিত্যে। কয়লাখনির অতল থেকে লেখক তুলে আনলেন দীপ্ত প্রাণের হীরক খন্ড। রানীগঞ্জ ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাকুঠির অধিবাসী সাঁওতাল, বাউরি, কুলি কামিনদের সুস্থ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আদিম জীবনের নিঃসংকোচ প্রেম ঈর্ষা আত্মত্যাগ ও অকুণ্ঠ স্থূল উদ্দমতার বলিষ্ঠ সরল কাহিনী বাঙালি পাঠকদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ অভিভূত করে দিল। বস্তুত শৈলজানন্দ কয়লাকুঠি অঞ্চলের গল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের আঞ্চলিক (Regional) বা স্থানীয় রঙ (Local colour) বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়ে উঠল।"*[৯]

তাঁর পূর্বে বিশ্বসাহিত্যে কয়লাকুঠি নিয়ে সাহিত্য রচনা হলেও তাঁদের হতদরিদ্র জীবনচর্চার অভিজ্ঞতা আশ্চর্যভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে শৈলজানন্দের হাতেই, তাঁর গল্প চমৎকৃত করে তুলেছে বাংলা সাহিত্যকে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পৃ. ১০।
২. মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদনা)। বাংলা ছোটগল্প: পর্ব পর্বান্তর। পৃ. ১১৬।
৩. পাল, রবিন। কল্লোলিত ছোটগল্প। পৃ. ১২৭।
৪. তদেব, পৃ. ১৩০।
৫. মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদনা)। বাংলা ছোটগল্প: পর্ব পর্বান্তর। পৃ. ১২০।
৬. পাল, রবিন। কল্লোলিত ছোটগল্প। পৃ. ১২৮।
৭. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা। তদেব, পৃ. ২১৩।
৮. পাল, রবিন। কল্লোলিত ছোটগল্প। পৃ. ২২৭।
৯. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৭, পৃ. ২২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ। কয়লাকুঠির দেশ। কলিকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৫, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পাদনা)। বাংলা ছোটগল্প: পর্ব পর্বান্তর। প্রকাশক, অজিত কুমার জানা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯।

২. পাল, রবিন। কল্লোলিত ছোটগল্প। কলেজ স্ট্রিট, ৮৬ এ, কলকাতা -৭৩, বইমেলা ২০০৯।
৩. বন্দোপাধ্যায়, সরোজ। বিপন্ন রোম্যান্টিক শৈলজানন্দ। দেশ, ২৯ এপ্রিল ২০০৯।
৪. চৌধুরী, নন্দ। শিল্প, শিল্পশ্রমিক ও বাংলা সাহিত্য। একুশ শতক পত্রিকা, মাসিক, পঞ্চদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রকাশ-২০২০।
৫. দে, গোপীনাথ। আকাশের নিচে মাটির গভীরে: প্রসঙ্গ কয়লাখনি। যুবমানস, শারদসংখ্যা, ২০০০।
৬. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯।
৭. লাহিড়ী, সৌমিত্র। শ্রমজীবী মানুষের গল্প। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা-৭৩।
৮. চৌধুরী, ভাস্কর। ছোটগল্পের অন্দরমহল। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা ০৯।
৯. চৌধুরী, ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭।
১০. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা। দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ২০০৯, কলকাতা।